বই-শাখে পঁচিশ

(বৈচিত্র্যময় গল্প সংকলন)

বাণীব্রত গোস্বামী

নিবেদন

আজ স্বীকারোক্তির সময় আসন্ন। বলতে দ্বিধা নেই, এই সংকলনের নামকরণ 'অতিমারীর অভিজ্ঞান' রাখলেও অত্যুক্তি হত না। যদিও এই নামে আমার একটি নিবন্ধ সানন্দায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। তবে কেন ওই নামকরণ সঠিক হত, সেই গল্প এখানে প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘ অতিমারীতে শুরু হল এক অজানা নিভৃতনিবাস। কর্মহীন, অফুরন্ত সময়ের অলস জীবনযাপন। নানা মানুষ নানাভাবে যাপন করতে লাগল তাদের জীবন। আমার ভেতর চাগাড় দিয়ে উঠল পুরোনো নেশা। যার জন্ম হয়েছিল এক প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থায় কর্মজীবন শুরু করার সুবাদে। কিন্তু চাপা পড়ে গিয়েছিল দৈনন্দিন নিত্য কর্মের ব্যস্ততায়। সেটা আর কিছু নয়, লেখালেখির বদ অভ্যাস। যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু হয়ে গেল সেই অবসর সময়ে লেখালেখির নতুন অধ্যায়। তবে দিশাহীনভাবে, উদ্দেশ্য বিহীন। জানতে পারল বাল্যবন্ধু অভিজ্ঞান। জোগাল সাহস, প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহিত করতে লাগল ওর অনুপ্রেরণা। প্রতিদিন পাখি পড়াতে লাগল আত্মোপলব্ধির বাণী দিয়ে। আত্ম প্রচারিত হওয়ার চাপ বাড়তে লাগল আমার ওপর। তবে তখন ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। বহু প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকার প্রশ্রয় জুটে গেল। প্রকাশিত হল একের পর এক। আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল আমার। প্রথম লেখা প্রকাশিত হল একটি অণুগল্প, 'দেশ' পত্রিকায়। আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। লিখে ফেলতে লাগলাম জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা। তাই এই সংকলন এক অতিমারীর চিহ্ন বা অভিজ্ঞান স্বরূপ। যার ভেতর একাধারে লুকিয়ে আছে আমার ছায়াসঙ্গী অভিজ্ঞান, আমার বাল্যবন্ধু, ও আমার ফেলে আসা জীবনের পথের চিহ্ন। তবে এর পরেও কিছু কথা বলার আছে।

ইচ্ছের সুতো দিয়ে প্রায় তিন বছর আগে যে কল্পনার জাল বোনা শুরু হয়েছিল, তাতে স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনলেন যে মানুষটি, তিনি হলেন বইবন্ধু প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। যিনি প্রকৃতই এক ভাতৃবৎ বন্ধু। এক অপ্রত্যাশিত ভরসা দিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন গল্প সংকলন প্রকাশ করার। আমি তাঁর কাছে একান্তভাবে ধন্য ও অশেষ কৃতজ্ঞ।

তবে সাহস জোগালেই তো আর সাফল্যের বৈতরণি পার হওয়া যায় না। তার জন্য চাই উপযুক্ত কাণ্ডারি। এক্ষেত্রেও আবার ভাগ্যদেবী আমার সুপ্রসন্ন হলেন। বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন বর্তমান বাংলা সাহিত্য জগতের প্রখ্যাত ও যোগ্য সম্পাদক সুদীপ দেব মহাশয়। আমার আর-এক ভালোবাসার মানুষ। বড়ো যত্ন করে আমার জীবনের নদীতে কুড়িয়ে নেওয়া স্মৃতির নুড়িপাথরগুলোকে সাজিয়ে গড়ে তুললেন এক সামান্য মানুষের ফেলে আসা নানা রঙের দিনের এক অসামান্য অজানা কথকতা। সর্বোপরি যাদের জন্য এই আনন্দ আয়োজন, সেই পাঠককুলের সাহচর্যের সামান্য স্নেহ-স্পর্শ পেলেই এই অক্লান্ত উদ্যোগ সাফল্যের মুখদর্শণ করবে। ফলস্বরূপ আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপে আরও বেশি উৎসাহিত হব। এই বইয়ের সঙ্গে জুড়ে থাকা সকল মানুষকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও বুকভরা ভালোবাসা।

বাণীব্রত গোস্বামী
জুলাই, ২০২২

সূচিপত্র

১১ শূন্য গহ্বর
১৭ সুতানুটির চুপকথা
২৪ অর্থের অর্থ
৩০ মধুরেণ সমাপয়েৎ
৩৬ পৌনঃপুনিক
৪৪ ফরাসডাঙায় ফুলেশ্বর
৪৭ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ
৫৪ ভালোবাসার উপত্যকা
৬০ নিপাতনে সিদ্ধ
৬৭ জাতিস্মর
৭৩ তিনে নেত্র
৮০ অশরীরী প্রহরী
৮৩ ফেসবুকে ফেকভূত
এক ব্যাগ খুশি ৮৯
মেঘ ভাঙা রোদ ১০১
ঈশ্বরের রক্তে বিষ ১০৫
ভাগ্যবান সাবান ১১২
মধুযামিনী রে... ১২০
শুক্লপক্ষ ১৩৩
লজ্জাবতীর বাসা ১৪০
নীলনদের নীলনয়না ১৪৭
ওপরের পিসেমশাই ১৫৬
পুণ্যভ্রমণ ১৬৩
ছবি-বিশ্বাস ১৬৬
বন্দিনী বিহঙ্গ ১৭০

শূন্য গহ্বর

চিলেকোঠায় চুম্বন, মাত্র একটা চুম্বন। তারপর বাকি জীবন শুধু ঘূর্ণন। মনের মধ্যে ভীষণ নিকষ কালো ঘূর্ণন। ঘড়ির কাঁটার উলটোদিকে দূরন্ত গতিতে পাক খাচ্ছে। সব শুষে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। সব, সব কিছু। হু হু করে বিচার, বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছে। সর্বগ্রাসী। কিছু বোঝা গেল না তো? জানি। আসলে আমি অপ্রকৃতিস্থ। আমি তা বিশ্বাস করি না। ডাক্তার বলে। যতটা সম্ভব গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। আমার ছোটো জানলা দিয়ে আধঘণ্টা আলো আসে। জানলার শিকে আলো তিনভাগ। আলোর ভেতর লক্ষ লক্ষ মুহূর্তের কণা। সব রকম মুহূর্ত। আলাদা আলাদা। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই। তাই আলো আমার ভালো লাগে না। কিন্তু তার মধ্যেই লিখতে হবে আমাকে। লিখতেই হবে।

সেদিন মেঘঝামটা বৃষ্টির বিকেল। ফুটবলের মাঠে ঘাসের নীচে জল। কোথাও কাদায় মাখামাখি। আমরা দাপিয়ে ফুটবল খেলছি। সবার নাম মনে করতে পারছি না। তবে সুবিমল ছিল। খেলেই যাচ্ছি। সবাই হাঁপিয়ে যাচ্ছে। আমার অফুরন্ত দম ফুরোচ্ছে না। বায়ুমণ্ডলের মতো মাথা থেকে ফুসফুসে নামছে। সন্ধে হয় হয়, শরীর আর চলছে না। সুবিমলকে বললাম, "চল পুকুরে চান করে বাড়ি যাই।" জলে নেমে ফিসফিস প্রশ্ন আমার, "তুই সুচরিতাকে ভালোবাসিস?" সুবিমল হেসে ঘাড় নাড়ল। ও একটা কবিতা দেখিয়েছিল আমাকে, 'সুচি, তোমার বুকে মাথা রেখে নরম উষ্ণতা চাই না, চাই শুধু অনুভূতি। প্রেম দিয়ে বাঁধব না, ভালোবাসা, দাও একটু সহানুভূতি।'

মাথার মধ্যে আবার সেই ঘূর্ণন। একটা কালো গহ্বর। বিবেক, বুদ্ধি, বন্ধুত্ব সব ঢুকে যাচ্ছে সেই কৃষ্ণ-গহ্বরে। বুদ্ধি খাটালাম, "আমিও মনে মনে ওকে

ভালোবাসি, তুই পারবি পুকুর এপার-ওপার করতে? আমি পারব। চল না চেষ্টা করে দেখি। তুই পারলে আমি ওকে মন থেকে মুছে ফেলে দেব।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল সুবিমল। ওপারে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। আবার ফিরে যেতে বললাম। আমার গায়ে তখন পাগলের শক্তি। ফেরার সময় মাঝপুকুরে সুবিমল আর পারছে না। চিৎকার করছে, "কুশল, একটু হাতটা ধর, একবার, প্লি—জ, পিঠে হাতটা রাখতে দে।"

আমি ওর পাশ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলাম। আর সুবিমলকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু হাত দুটো, তারপর একটা হাত। শুধু ডান হাতের পাঁচটা আঙুল। অনামিকা! সূর্য টুপ করে ডুবে গেল। কালো জল। নির্জন পুকুর। আর কোথাও নেই সুবিমল। মাথার মধ্যে ঘূর্ণন থেমে গেছে। এখন শান্তি। দৌড়ে পাড়ায় এসে চিৎকার করলাম, "সুবিমল ডুবে গেছে!"

আবার ভুল হয়ে গেল। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আগেই বলে নেওয়া উচিত ছিল, সুচরিতা কে? সুচরিতা আমার বাংলা ছাত্রী। আমি তখন কলেজ, ও ক্লাস নাইন। জানাতে পারিনি কোনওদিন মনের কথা। টেবিলের নীচে পায়ে পায়ে দু-একবার কথা হয়েছিল। সব বুঝতে পারি। তবু তো শিক্ষক! বাঁধ ভাঙল পরের বছর মাঘপঞ্চমীতে। সরস্বতী পুজোয়। একটা লেখা দেখানোর ছুতোয়, হাত ধরে চিলেকোঠায় নিয়ে গেল, তারপর সেই চুম্বন! ঠিক আমার ঠোঁটের জরুলের ওপর। লোকে বলে ওখানে আমার নাকি সৌভাগ্য। কালো মেঘের মধ্যে, রুপোলি বিদ্যুতের মতো আমার শিরা উপশিরায় একটা শিহরণ খেলে গেল। অপলক তাকিয়ে থাকলাম সুচরিতার দিকে। তারপর সারাজীবন। রক্ষা করতে পারিনি আমি, ওর প্রেম। না পারলাম শিক্ষক হতে, স্কুলে ঢুকলাম, তবে কেরানি হয়ে। না হতে পারলাম ওর ভালোবাসার রক্ষক বা ভক্ষক। পুজোর জামাকাপড়ের মতো সে ভালোবাসা মাথার কাছে রেখে দিলাম, অষ্টমীতে ভেঙে পরব বলে। এখন ডোরাকাটা জামা পরে যক্ষ আমি এই চোর কুঠুরিতে। আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসি সুচি-র কথায়। প্রেম গভীরতর হল। ওর হাসিতে ছিল বসন্তবাতাস। এক লহমায় আমার মনে শিমুল পলাশ সব ফুটে যেত, মনে হত, 'লাগল যে দোল'। কত রং সেখানে। রংধনুর

মতো। সব আলাদা আলাদা। শরীরে নয়, জামায় নয়, মনের মধ্যে সাপের শঙ্খের মতো তারা খেলছে। আজ সব এক জায়গায় জমে কয়লার খনির নীচের অন্ধকারের মতো কালো। একদিন না দেখলে মনে হত প্রকৃতি গুমোট। হাতে হাত দিলে মনে হত বৃষ্টি আসছে। পৃথিবীর সব সাফল্য ফুল হয়ে ঝরবে আমার মাথায়। ভোরের জানলা দিয়ে ওর গানের রেওয়াজ, আমার ইন্দ্রিয়সুখ। ও কাঁদলে মনে হত পৃথিবীতে ধ্বংস আসছে। ওর সেই কান্না চাপা পড়ে গেল সানাইতে। টুনি দিয়ে সাজানো বাড়ির ভেতর সুচরিতা। ওর মনের ভেতর গভীর অন্ধকার। চিকচিক করছে চোখের কোণে একফোঁটা জল, তবে তার থেকেও বেশি ঝিকমিক করছে গলায় জড়োয়ার সেট। সিঁথির মেলায় হাত ধরে ঘোরার স্মৃতি ঢেকে গেল লেপটানো সিঁদুরের নীচে। ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুচরিতার। আবার গুলিয়ে গেল। সুচরিতার কথা বলতে শুরু করলে খেই হারিয়ে ফেলি। কলম থামতে চায় না। তবে আজ কলমে অনেকটা আলো ভরে নিয়েছি। অনেকদিন চেষ্টা করেছি, পুরোটা বলতে পারিনি। তার আগেই সব কালো, অন্ধকার? আজ বলবই। একটা ঘটনা বাদ পড়ে যাচ্ছে।

সেবার বিজয়া সম্মিলনীতে নাটক হবে, ওথেলো। স্বভাবতই দেসদিমনা সুন্দরী সুচরিতা। আমি জানি আমাকে ওথেলো মানাবে না। ওথেলো হল সুপুরুষ সুবিনয়। আমাকে দিল রোডারিগোর-র চরিত্র। বারবার অনুরোধ করলাম, সুবিনয়কে চুম্বন দৃশ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে চুম্বন না-খেতে। রিহার্সালে সব ঠিকঠাক ছিল। নাটকের দিন সুযোগসন্ধানী সুবিনয় দর্শকদের দিকে আড়াল করে, ঠিক ঘনিষ্ঠ হয়ে চুম্বন করল সুচরিতাকে। সুচরিতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সুবিনয় যুক্তি দিল, নাটকের স্বার্থে। মঞ্চের পিছন থেকে সবটাই দেখলাম আমি। আবার সেই ঘূর্ণন। হু হু করা একটা কালো চরকিপাক। সুখ-দুঃখ, সম্পর্ক, সমাজ, ধৈর্য সব ঢুকে যাচ্ছে। অবচেতন মস্তিস্ক তো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে। শীতের পিকনিক। জামশেদপুর, দলমা পাহাড়। সোনালি আলো খেলছে লেকের জলে। পিছনে সবুজ পাহাড়ে, ঘন জঙ্গলের হাতছানি। সুবিনয়কে বললাম, "একটা ছবি তুলে দিবি ভাই?"

সুবিনয় বলল, "আর একটু পিছিয়ে যা।"

আমি শান্ত, বলে উঠলাম, "পাহাড়টা ভালো আসবে না, তুই আর একটু পিছিয়ে যা, আর একটু, আমি দেখছি, আর একটু..."

খাদের দিকে ছিল সুবিনয়। এইমাত্র। আর নেই। কোথাও নেই। মুহূর্তের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। ঘূর্ণন থেমে গেল। মাথা শান্ত। আইন আমাকে ছুঁতে পারল না। দু-চারবার জেরা হল বটে। তাতে লাভ কিছু হল না। সমস্যা হল অন্য জায়গায়। পাড়ায় সবাই সন্দেহ শুরু করল। কারণ দুটি ক্ষেত্রেই আমি মৃত্যুর খুব কাছে ছিলাম। মৃত দুজনেই সুচরিতার পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ। কেউ খুব একটা মিশত না আমার সঙ্গে। কথাও বলত না। আত্মীয়, অফিস সব দূরে সরে যেতে লাগল। আমি একা হয়ে গেলাম। ভীষণ একা। আপনমনে কথা বলি। অনেকে পাগল বলে। বিশ্বাস করুন আমি পাগল নই। আমি স্বাভাবিক, একদম সুস্থ। আমার খিদে পায়, ঘুম পায় সবার মতো। আমার এখনও গান ভালো লাগে। আমি শুনি, 'আকাশভরা সূর্য তারা'। ঘূর্ণন নেই। কৃষ্ণগহ্বর নেই। কিছু হারিয়ে যাচ্ছে না। বিশ্বভরা সব প্রাণ ঠিক আছে। মৃত্যু নেই। আনন্দ আছে। এখনও শরতের আকাশে মেঘের রবীন্দ্রনাথ দেখতে পাই। বর্ষার নূপুর কানে বাজে। পরিষ্কার। পাগল হলে এরকম হত? দুর্গাপুজোর ঢাকে মন নেচে ওঠে। সিঁদুরখেলায় মন খারাপ হয়। সরস্বতী পুজোয় ছেলেমানুষ হতে ইচ্ছে করে। বসন্তে মনে হয় একটা কবিতা লিখি। খুব ইচ্ছে করে। সুচরিতাকে নিয়ে। পারি না। ঈশ্বর আমাকে সে ক্ষমতা দেয়নি। কেন? তাহলে আমার এরকম হত না। আমি তো কবিতার ঘরে ভালো থাকতাম। কবিতাকে আঁকড়ে থাকতাম। ভালোভাবে বেঁচে থাকতাম। সুচরিতা এলে আমার সঙ্গে দেখা করে না। কথা বলে না। গত বছর বিজয়ায় এসেছিল বাপের বাড়ি প্রণাম করতে। দূর থেকে দেখছিলাম সিঁদুরখেলা। ধীরে ধীরে এগোলাম। একদম কাছে। গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেমন আছ?" খোলা চুলের একটা গোছা কপালের ওপর। ব্রহ্মকমলের পাপড়ির মতো গালে সিঁদুরের মাখামাখি। আগুন রঙের শাড়ির ওপর ফিরোজা ব্লাউজ। চোখে নববধূর মতো লজ্জা। একমুখ হেসে ঘাড়ের হালকা ঝাঁকুনিতে কপালের চুল পিঠের ওপর ফেলে দিল। অচেনার মতো পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আর এক মহিলার গালে সিঁদুর দিয়ে দিল। দু-ফোঁটা সিঁদুর

ছিটকে এসে লাগল আমার সাদা পাঞ্জাবিতে। আমার প্রেমের ভাগশেষ। আমি জানি ওর সুখিয়া স্ট্রিটে বিয়ে হয়েছে। কেউ আমাকে ভয়ে ওর ঠিকানা বলে না। ঠিকানা বললে কী হয়? আমি কি ওর ক্ষতি করব? আমি কি খুনি? আমি হাসতে চাই, গল্প করতে চাই, গল্প বলতে চাই। আর পাঁচ মিনিট আলো থাকবে। তারপর আলো সরে যাবে। সব অন্ধকার। কালকে এই সংশোধনাগার থেকে আমাকে ওরা মনোবিকাশ কেন্দ্রে নিয়ে যাবে। আমি নাকি প্যারানিউরো সাইক্রিয়াটিক। একটা ভয়ংকর স্মৃতি, পুনর্দৃশ্যায়ন দেখলেই মাথায় খুন চেপে যায়। খুনের পর সব স্বাভাবিক, সব শান্ত। আমাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিল। ঘুমোইনি। সব শুনেছি। ওষুধে আমার কাজ হয় না। ওরা জানে না। কিন্তু আমি এখানে কেন? সেটা আগে বলে নেওয়া উচিত ছিল। উলটোপালটা হয়ে যাচ্ছে। হাতে সময় কম। সবটা বলে নিতে হবে। সবাইকে বলতাম, ওকে একবার শুধু দেখব। আমার এক বাল্যবন্ধু ওর মোবাইলে একটি ছবি দেখাল। সুচরিতার। ঘনিষ্ঠ ছবি। ওর স্বামীর সঙ্গে। মানে ড. সুরজিৎ মিত্র। বড়ো ডাক্তার। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ।

অনেকদিন পর। আবার সেই ঘূর্ণন। হু হু করে অ্যাড্রিনালিন নিসঃরণ হচ্ছে। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সব তলিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে। সুযোগ এসে গেল হাতের মধ্যে। স্কুলের সহকর্মী বারিকবাবুর বুকের বাঁ-দিকটা চিনচিন করছে। বললাম, ডাক্তার দেখিয়ে নিন। আমার জানা ভালো ডাক্তার আছে। আমি নাম লিখিয়ে দেব। খুঁজে খুঁজে বার করলাম, শ্যামবাজারের চেম্বার। নাম লেখাতে গেলাম। উঁকি মেরে দেখে নিলাম ভেতরটা। ডাক্তারবাবু বসে আছে। টেবিলে একটা বিসলারি জলের বোতল। বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। পরদিন বারিকবাবুকে নিয়ে গেলাম ডাক্তারখানায়। শুয়ে পড়তে বললেন বারিকবাবুকে বিছানায়। মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমার ব্যাগ থেকে বার করলাম সাদা পাউডার মেশানো জলের বোতলটা। ডাক্তারবাবুর বোতলের পাশে রাখলাম। তারপর আস্তে করে ডাক্তারবাবুর বোতলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। ঘণ্টা তিনেক পরেই টিভিতে খবর। 'প্রখ্যাত চিকিৎসক ড. সুরজিৎ মিত্রর বিষক্রিয়ায় অস্বাভাবিক মৃত্যু। খুন না আত্মহত্যা?' তবে এ যাত্রায় বিধি

বাম। পেশেন্ট লিস্ট ধরে বারিকবাবুকে জেরা করতেই আমি ধরা পড়ে গেলাম। তবে তাতে আমার উপকারই হয়েছে। এখন রোজ যখন-তখন ঢুকতে পারি ওই কালো গর্তটার মধ্যে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাক। খুব অন্ধকার। অসীম, অনন্ত। একদম কেন্দ্রে যেতে অনেক সময় লাগে। তবে ওখানে একটা আলোর বিন্দু আছে। খুব উজ্জ্বল। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তবু আমি দেখতে পেয়েছি সুচরিতার মুখ। ঠোঁটদুটো কাঁপছে।

ওরা আমাকে সুস্থ করতে চাইছে। কিন্তু কেন? আমি তো অসুস্থ নই। ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি জানি কী করলে আমি ঠিক হয়ে যাব। শুধু একবার। মাত্র একবার। ঠিক আমার ঠোঁটের ওই জরুলটার ওপর যদি একটা চুম্বন। সুচরিতার। ওফ্ শান্তি। কী শান্তি! আমি ঠিক হয়ে যাব। একদম ঠিক। বিশ্বাস করুন। সত্যি। মাথার পিছন দিকটায় ব্যাথা করছে। একটা সর্ট সার্কিটের মতো। একটা বিদ্যুতের স্পার্ক। সুচরিতার সঙ্গে দেখা হলে একটু বলবেন? বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি অপেক্ষায়...।